শস্য সুরক্ষা

আমরা একত্র আজ শস্য সুরক্ষায়

দ্বিতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

অক্টোবর, ২০০৮

অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রটেকসন (এ এ পি পি)
বি সি কে ভি, কল্যানী, নদীয়া ৭৪১২৩৫

SASHYA SURAKSHA
Oct. Issue, 2008
Quaterly Bulletin of Association for Advancement in
Plant Protection (AAPP)
Plant Health Clinic, BCKV
Kalyani - 741235
Published by SHANTANU JHA

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ শঙ্কর ধর

প্রকাশক
শান্তনু ঝা, সচিব
এ্যাসোশিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রোটেকশন, উদ্ভিদ স্বাস্থ্য কেন্দ্র,
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫

মুদ্রক
কৌশিক দত্ত, লেসার এইড্ প্রিন্টার্স, বি-৯/১০৭, কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫
মোবাইল - ৯৮৭৪৩৬৪৯৮৪

পরিবেশক
এ.এ.পি.পি., উদ্ভিদ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী - ৭৪১২৩৫

দামঃ ১০ টাকা

সম্পাদকমন্ডলী

মুখ্য সম্পাদক নীলাংশু মুখার্জী

সচিব শান্তনু ঝা

সদস্যগণ মনোজ রঞ্জন ঘোষ
চিত্রেশ্বর সেন
অসিত কুমার মুখোপাধ্যায়
সুজিত কুমার রায়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ঃ দু'চার কথা ৩
শস্য সুরক্ষার গতিপ্রকৃতি ৪
সুরক্ষার সুপারিশ ৪
পরিচর্যা দিয়ে সুরক্ষা ৫
ফসলের শত্রু ঃ ৫
আক্রমনের লক্ষন ও প্রতিবিধান ৫-৮
শীতের আঘাতজনিত উপসর্গঃ ধান ৮
কীটশত্রু দমনের জন্য বন্ধুপোকা ৯
ফসলের ডাক্তারি ১০
দেশজ সুরক্ষা ব্যবস্থা ১০
পোকা ধরা ফাঁদ ঃ আলো ফাঁদ ১১
জৈব কীটনাশক ঃ নিমাটোড ১১
লাল সংকেত ১২
ফসলের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ঃ ১৩
আগাছা পরিচিতি ১৪
সুরক্ষা খবর ১৫
সুরক্ষার কেলেঙ্কারি ১৫

সম্পাদকীয় ঃ দু'চার কথা

■ ভারতে ২,৩০০ টন পেঁপে উৎপাদন হয় বছরে। বিগত দশকে পেঁপে চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাইওয়ান ও হাওয়াই এর ভ্যারাইটিগুলিও আছে এলাকা বৃদ্ধির পেছনে। কিন্তু বিদেশি ভ্যারাইটিগুলি নিয়ে এসেছে রিংস্পট ভাইরাস জনিত ভয়ঙ্কর রোগ। পেঁপের বিপুল ক্ষতি করে। তরমুজ, স্কোয়াস, শসা প্রভৃতি ফসলেও লাগে এ ভাইরাস। এই ভাইরাসের মুখ্য বাহক জাব পোকা এপিস গসিপি। সাধারণত রোগ না হলে পেঁপে গাছ ৪-৫ বছর ফল দেয়। কিন্তু এই রোগাক্রান্ত গাছ বড় জোর ১ বছর ফল দেবে। প্রতিবিধান হিসাবে চারা মাঠে রোপন করার আগে বীজতলাতে কীটনাশক স্প্রে করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত চারা বেছে ফেলে নিতে হবে। কিছুদিন অন্তর চারা লাগানোর অভ্যাস পাল্টাতে হবে। হাওয়াইতে সৃষ্টি করা 'রেনবো' ভ্যারাইটিও এদেশে রোগগ্রস্থ হচ্ছে।

■ মালদাতে 'আমের মধু'র দিন বোধ হয় ফুরালো। কারণ ব্যাপক পেস্টিসাইড ব্যবহার। মৌমাছি আর আমবাগানে যাচ্ছে না, যাচ্ছে সর্ষে ক্ষেতে। ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকাতেও মৌমাছির ব্যাপক মৃত্যুর পর বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন একটি নিওনিকোটিনয়েড পেস্টিসাইডকে। ভুট্টার শিকড়ের পোকা দমনে ব্যবহার হত এমন ৭টি পেস্টিসাইডকে জার্মানী নিষিদ্ধ করেছে। ফ্রান্স এ নিষিদ্ধ করেছে ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০৩। আমেরিকাতে মৌপালকরা ৩০ শতাংশ মৌমাছি হারিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছে এই জাতীয় ওষুধগুলি মাছির স্মৃতি এবং মস্তিস্ক নষ্ট করে। ফলে মৌমাছি মনে করে বাসায় ফিরতে পারে না। ভারত, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি, ফ্রান্স, গ্রীস এবং ইংলন্ডেও এই মৌমাছির পথ হারানো এবং 'চাক' ধ্বংস হবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। অথচ ভারতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পেস্টিসাইডগুলির একটি ইমিডাক্লোপ্রিড। পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের আমবাগানগুলিতে ব্যাপকহারে 'ফেরোমোন ফাঁদ' ব্যবহার হোক। প্রয়োজনে এ এ পি পি সস্তায় এই ফাঁদ তৈরি ও সরবরাহ করতে পারে।

নীলাংশু মুখার্জী
সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষে

রিং স্পট ভাইরাস জনিত পেঁপের রোগের লক্ষণ

শস্য সুরক্ষার গতিপ্রকৃতি

■ পেস্টিসাইড ব্যবহারে ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ (১৪৯ গ্রা/হে) উৎপাদনে সপ্তম (৮২০ কেজি/হে)। জাপান উৎপাদন (৫৪৮০ কেজি/হে) এবং ব্যবহারে (১০.৮ কি.গ্রা/হে) প্রথম।

■ ভারতে ১৮টি রোগ জীবাণু (ফসলের) ২৪টি ছত্রাক নাশক এর বিরুদ্ধে সহনশীল হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম বাদামের বেনোমিল সহনশীল সারাকোস্পোরা, আপেলের কার্বেন্ডাজিম সহনশীল ভেনচুরিয়া, নানাফসলের কার্বেন্ডাজিম সহনশীল ম্যাক্রোফোমিনা ও স্কেলেরোসিয়াম, বেনোমিল সহনশীল ফুসেরিয়াম এবং অরিওফনজিন সহনশীল অলটারনেরিয়া।

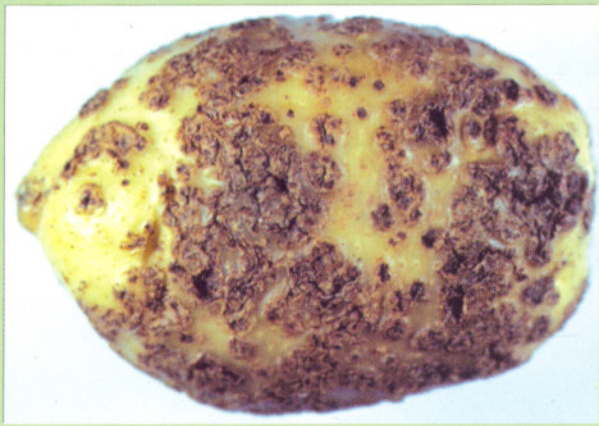
আলুর খোস রোগ

■ নিম পাতার নির্যাসে বাদামের পাতার রোগগুল খুব ভালো সামলানো গেছে। কান্ডের স্ক্লেরোসিয়াম ভাল দমন হয়েছে তামাকের নির্যাসে।

■ ভারতে ফসলের রোগদমনোপোযোগী ট্রাইকোডার্মার ১৩টি প্রজাতি চিহ্নিত। এদের ব্যবহারে বিভিন্ন ফসলের ৩২টি রোগ দমন করা গেছে। মুগ ও কলাই এর পাতা ঝলসানো বা চা এর গোড়া পচাও নিয়ন্ত্রণ হয়েছে।

■ পেঁয়াজের পাতা ঝলসানো ও বেগুনি দাগ রোগ প্রতিরোধী ভ্যারাইটি চিহ্নিত হয়েছে আর.ও.৫এ। হলুদের পাতার দাগ ও পাতা ঝলসানো রোগের ৬ টি সহনশীল ভ্যারাইটি পাওয়া গেছে।

■ আলুর খোসরোগ দমন হয়েছে সয়াবীনের সঙ্গে ফসল চক্রে। ঢলেপড়া দমন হয়েছে ভুট্টা বা বাজরার সঙ্গে ফসল চক্রে।

সুরক্ষার সুপারিশ

সরষের গড় ফলন এদেশে ১১৫১ কেজি/হেক্টরে। ফলে বিপুল পরিমানে ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয়। সরষের ফলন কম হবার একটি কারণ অলটারনেরিয়া ঝলসানো রোগ। বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ যা দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে ম্যানকোজেব স্প্রে করা। বীজ বোনার ৪৫ দিন ও ৭৫ দিন পরে দুবার। এই ব্যবস্থার রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হলেও সরষের ফলন ক্ষমতা অনুযায়ী ফলন পাওয়া যাচ্ছিল না।

সর্ষের পাতা ঝলসানো রোগের লক্ষণ

ভরতপুরের জাতীয় সরষে গবেষণা কেন্দ্রে ২০০২ - ০৩ ও ২০০৩ - ০৪ বর্ষে মাঠে যে পরীক্ষা করা হয় তাতে দেখা গেছে রসুনের নির্যাস জলে লিটারে ১০ গ্রাম হিসাবে তৈরি করে বীজ বোনার ৪৫ ও ৭৫ দিন পরে দুবার স্প্রে করলে সর্বোচ্চ পরিমান সরষে বীজের ফলন পাওয়া যায়। প্রথমত

মাঙ্কোজেব স্প্রে করলে এর চেয়ে হেক্টরে মোটামুটি ২০০ কেজি কম ফলন পাওয়া গেছে। কারণ হিসাবে বলা যায় রোগটি রসুন নির্যাস স্প্রে করার ফলে পাতায় ৩১.১ শতাংশ এবং শুঁটিতে ২০.৪ শতাংশ কমে গেছে। খরচের দিক থেকে এই রসুন নির্যাস স্প্রে করার ক্ষেত্রে লাভ ও খরচ অনুপাত ম্যানকোজের স্প্রের চেয়ে বেশি হয়েছে। (সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান ফাইটোপাথলজি)

পদ্ধতি ও পরিচর্যা দিয়ে সুরক্ষা ঃ 'শ্রী' পদ্ধতিতে ধান চাষ

ধানগাছের প্রকৃতি অনুযায়ী ধান চাষ করলে খরচ কম, উৎপাদন বেশি হওয়া ছাড়া রোগ পোকা কম লাগে। ফসল তার সহনশীলতার পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে। ধান ফসলকে অনাবশ্যকভাবে জলে ডুবিয়ে না রেখে শুধু কাদায় রোয়া করলে শিকড় যথেষ্ট প্রসারিত হয়ে ধানের জিনগত ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটায়। এক একর জমির জন্য মাত্র ৩-৪ কেজি (২০-২৫ কেজি নয়) বীজ ফেলে ৮-১২ দিনের (বেরোতে ১৫-১৮) ২ পাতা চারা কাদা জমিতে ১০ ´ ১০ ইঞ্চি দূরত্বে ১ টি করে (গুছিতে) রোয়া করা হয়। বর্গামিটারে ১৬টি গুছি (৩৩টি নয়) থাকে। যথেষ্ট জৈবসার দেওয়া হয় এবং সারি মধ্যবর্তী বেশি জায়গাতে জল না থাকায় যে বেশি আগাছা জন্মায় তা 'প্যাডি উইডার' দিয়ে কাদায় মিশিয়ে পচিয়ে দেওয়া হয়। অনেক কম পরিমান সেচের জলে মাটি ভেজানো, শুকানো হতে থাকে। দূরত্বে বেশি হওয়াতে ভিতরে রোদ হাওয়া ঢুকে বাদামি শোষক পোকা ও খোলা পচা রোগের প্রকোপ একেবারে কমিয়ে দেয়। ফসল মধ্যবর্তী আর্দ্রতা কম হওয়াতে, রৌদ্র পৌছানোতে এবং যথেষ্ট জৈবসার পড়াতে ফসলে পুষ্টি যথেষ্ট হয়। ফলে ফসলের রোগ পোকা সহনশীলতা যথেষ্ট বাড়ে। পরিবর্তিত ফসল মধ্যবর্তী আবহাওয়াতে ফসলের বন্ধু পোকা বা কীটের শত্রু পোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাধারণত পদ্ধতির ধান চাষে অত্যধিক নাইট্রোজেন সার দেওয়ার ফলে ফসলের পুষ্টির মধ্যে কোন সুষম অবস্থা থাকে না। ফসল রোগ পোকায় বেশি আক্রাণ্ত হয়। তাই শ্রী-ধানে সে সম্ভাবনা কমে গিয়ে ফসল রোগ পোকা মুক্ত থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপে এই ধানচাষ পদ্ধতির প্রথম সৃষ্টি ১৯৮৩ সালে। পুরোনাম-'সিস্টেম অব রাইস ইনটেন্সিফিকেসন'।

'শ্রী' পদ্ধতিতে করা ধানের উন্নত শিকড় ও চাষ

(সূত্র ঃ মানবেন্দ্র রায় ও কাজল সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।

ফসলের শত্রু ঃ আক্রমনের লক্ষণ ও প্রতিবিধান

■ ভিন্ডি

● **মোজেইক রোগ ঃ** ভিন্ডি এ অঞ্চলে বছরের অনেকটা সময় চাষ হয়। নানা রোগে আক্রাণ্ত হলেও প্রধান সমস্যা হল সাহেব লাগা বা মোজেইক রোগ। আক্রাণ্ত গাছ ছোট হয়। পাতার শিরা হলুদ রঙ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাতার গোটা শিরা-জালিকা হলুদ হলে হলুদ-সবুজ ছোপের মোজেইক প্যাটার্ন হয়। এরপর যে নতুন পাতা বেরোয় বা ডগা বাড়ে তা

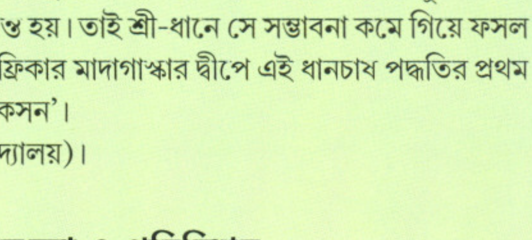

মোজাইক আক্রান্ত ভিন্ডি গাছ

তখন পাতা হলদে হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। পরে পুরো চারাটাই শুকিয়ে যায়। এটি একটি মাটি বাহিত রোগ। প্রতিকারের জন্য রোগমুক্ত মাটিতে চারা লাগাতে হবে।

গরমকালে মাটি ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে সেই মাটিতে কলম বসালে রোগ কম হয়। এছাড়া ছত্রাকনাশক কার্বেনডাজিম (১-১.৫ গ্রাম/প্রতি লিটারে) গোলা জল টবের মাটিতে চারা লাগানোর গর্তে ভিজিয়ে দেওয়ার পর কলম চারা বসালে এ রোগ বাড়ে না। চারা কলম বসানোর জায়গায় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা চাই।

পূর্ণাঙ্গ গাছের কচি ডগা কিংবা পুরো ডালই মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায়। ছত্রাক জনিত এই রোগটির প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত ডাল ডগা ছাঁটাই করার পর ১-২ বার কপার অক্সিক্লোরাইড ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

(সুত্র ঃ কৃষ্ণ কর্মকার ও সুজিত কুমার রায়, বিসিকেভি, কল্যাণী)

শীতের আঘাত জনিত ধান গাছের বিভিন্ন উপসর্গ ও তার প্রতিকার

ধান প্রধানতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের খারিফখন্দের স্বাভাবিক ফসল। এখন অবশ্য শীত প্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীতকালেও ধানের চাষ হয়ে থাকে। শীতের আঘাতজনিত কারণে ফসলের ক্ষতি আমন ও বোরো দু ক্ষেত্রেই হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে আমন ধান যৌনদশায় অর্থাৎ শিষের প্রাথমিক অবস্থা ও তার পরবর্তী সময়ে শীতের আক্রমনে পরে। আমন ধানের শীতজনিত আঘাতের লক্ষণগুলি হল - (ক) শিসের নিম্নভাগ পত্রবেষ্টনি থেকে বের না হওয়া। (খ) থোড় অবস্থায় শিসের পুষ্পমুকুল মরে যাওয়া। (গ) পরাগরেণুর বন্ধ্যাত্ব। এর ফলে শিসে ভূষি বাড়ে। ফলন কমে। শিস বেরনোর সময় জি.এ (জিব্বারেলিক এ্যাসিড) প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ধান চারায় শীতের আঘাত জনিত বিভিন্ন উপসর্গ

বোরো ধানের অঙ্কুরোদগম ও বীজতলায় চারা শীত আঘাত জনিত কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চাষীরা সাধারণত কল হওয়া অর্থাৎ অঙ্কুরিত বীজই বীজতলায় বোনে। তাই বীজতলায় শৈত্যজনিত অঙ্কুরোদগমের সমস্যা এড়ানো যায়। কিন্তু শীতের প্রকোপ সহ্য করতে না পারায় অনেক সময় ধানের বীজ তলা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

বীজতলার চারায় নিম্নরূপ শীত আঘাত জনিত লক্ষণ দেখা যায় ঃ ক) চারার বৃদ্ধি থমকে যায়। খ) সব পাতা ধীরে ধীরে সাদাটে হলদে হয়ে যায়। গ) পাতায় স্যাঁতসেঁতে ভাব আসা। ঘ) পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে যায়। ঙ) চারা মরে যায়।

প্রতিকার ঃ শীত আঘাত জনিত সমস্যা থেকে বীজতলা বাঁচানোর সহজ উপায় হল । ● বীজ বোনার সময় এমনভাবে স্থির করা যাতে কম বয়সী চারা প্রবল শীতের সময়টা এড়িয়ে যেতে পারে। ● শীতকালে পুকুর ডোবার ঠান্ডা জলে বীজতলায় ব্যবহার না করে টিউবওয়েলের অপেক্ষাকৃত গরম জল দিয়ে সকাল বেলায় হালকা করে সেচ দিলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। ● শীতের হাত থেকে ধানের চারা রক্ষার জন্য অনেকে বীজত লায়

ছাই-এর আস্তরণ তৈরী করেন। ছাই-এর আস্তরণ তাপের কুপরিবাহী হওয়ায় রাত্রিকালীন শীতের তীব্রতা শিকড়ের উপর কম পড়ে। অনেকের দাবী এইভাবে ভালো ফল পাওয়া যায়। ● এইসব ছাড়াও ধানের চারার শীত সহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কিছু পদ্ধতি পরীক্ষামূলক ভাবে সফল হয়েছে যেমন খুবই অল্প মাত্রায় অ্যাবসিসিক অ্যাসিড প্রয়োগ, ৪০-৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৪ ঘন্টা চারাকে রাখা অথবা ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তিনদিন ধরে চারাকে রাখা। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে কম খরচে প্রয়োগ যোগ্য।
(সূত্র ঃ শুভাশীষ মন্ডল, বি সি কে ভি, মোহনপুর)

কীটশত্রু দমনের জন্য বন্ধুপোকা

বন্ধুপোকার পরিচিতি

● **কক্সিনেলিড** ---- পরভোজী পোকার মধ্যে লেডিবার্ড বহুল পরিচিত। ফসলের বিভিন্ন প্রকার শত্রুপোকা যেমন যাব পোকা, দয়ে পোকা, আঁশ পোকা, শোষক পোকা, চোষি পোকা, মাকড় এবং অন্যান্য নরম দেহের পোকামাকড় ভক্ষণ করে। পূর্ণাঙ্গ পোকাটি ডিম্বাকার বা অর্ধ গোলকাকার ০.৮ থেকে ১৬ সেমি, লম্বা, চকচকে উজ্জ্বল লাল, কমলা, হলুদ ও কালো রঙের হয়। কখনো কখনো গায়ে ছোপ ছোপ কালো দাগ বা ফুটকি দেখা যায়।

বিভিন্ন রং-এর পূর্ণাঙ্গ লেডিবার্ড বিটল

গ্রাব ও পূর্ণাঙ্গ

এপিল্যাকনা(শত্রু পোকা)

গ্রাব (লেডিবার্ড)

গ্রাব ও পূর্ণাঙ্গ লেডিবার্ড

অনেক সময় সবজি জাতীয় ফসলের অন্যতম শত্রুপোকা এলিল্যাকনা বিটল থেকে চিনতে ভুল হয়ে থাকে। এই বিটলটি প্রায় একই রকম দেখতে কিন্তু গায়ের রঙ কিছুটা হালকা লালচে এবং অনুজ্জ্বল।

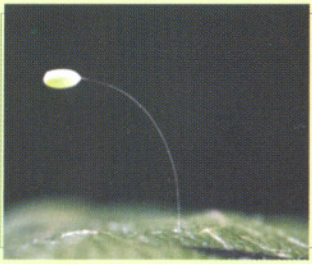
ডিম

লার্ভা

পুত্তলী দশা

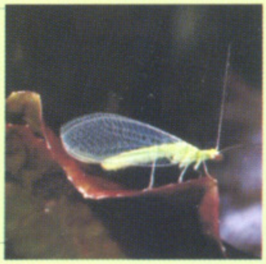
পূর্ণাঙ্গ পোকা

পূর্ণাঙ্গ পোকা ৩৫০টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমগুলো হলুদ রঙের পাতার তলায় একসঙ্গে খাড়া ভাবে সাজানো থাকে। অপূর্ণাঙ্গ দশা (গ্রাব) কাম্পোডিয়াম (লম্বাটে, চ্যাপটা ও সারা শরীর কাঁটাযুক্ত)।

● **ক্রাইসোপিড —** এরা নিউরোপটেরা বর্গের গ্রীন লেসউইংস নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ পোকাটি সবুজ রঙের ১.০-১.৩ সেমি লম্বা এবং ১.০-২.০ মিমি. চওড়া হয়। অ্যান্টেনা লম্বাটে (ফিলিফরম) ডানাগুলো বড় এবং অনেকটা ডিম্বাকার, তবে পিছনের ডানা কিছুটা সরু। ডানার শিরাবিন্যাস স্বচ্ছ, সুন্দর ও নিঁখুত ভাবে নিয়মিত। তাই এরা গ্রীন লেসউইংস নামে বহুল পরিচিত।

পূর্ণাঙ্গ পোকা এককভাবে বা গুচ্ছকারে পাতা, কান্ড, মঞ্জরী বা বাড়ন্ত ফলের উপর ডিম পাড়ে। ডিম গুলো ফ্যাকাসে সবুজ এবং একটা লম্বা দন্ডের (পেডিসেল) মাথায় লেগে থাকে। লার্ভাগুলো মাকুর মত এবং পুত্তলী দশায় ককুন তৈরী করে। একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা তার জীবদ্দশায় (৩০ দিন) ৭৮০টা ডিম পাড়ে।

পূর্ণাঙ্গ দশায় পোকাগুলো ফলের মধু ও পরাগরেণু খায়। কেবলমাত্র লার্ভা দশাটি ডিম, কীট ও পূর্ণাঙ্গ কীট শত্রুর পরজীবি। কৃষিক্ষেত্রেও বাগিচা ফসলের বিভিন্ন প্রকার শত্রু পোকা যেমন জাব পোকা, সাদা মাছি এবং অন্যান্য লেপিডপটেরা ও হোমোপটেরা বর্গের শত্রু পোকার পরজীবি (ক্রমশঃ)।

(সূত্র ঃ মতিয়ার রহমান খান, বিসিকেভি, কল্যাণী)

দ'য়ে পোকা আক্রান্ত ধান গাছ

ফসলের ডাক্তারি ঃ মাঝারি উঁচু জমিতে রোয়া ধান। জল সবসময় থাকে না। অনেক গাছ এখানে সেখানে আক্রান্ত। বেশ কিছু গাছে শীষ বেরোচ্ছে না। শীষ পাতার খোলাতে লালচে বাদামি লম্বা লম্বা ছোপ। কোথাও অর্ধেক বের হওয়া শীষে সাদা গুঁড়া গুঁড়া লেগে। স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞ 'সীথ-রট' বা বাদামি পচা খোলা রোগ হতে পারে ভেবে ছত্রাকনাশক দিতে বলেছেন। দেওয়াও হয়েছে মাঙ্কোজেব ও কার্বেন্ডাজিম। কাজ হয়নি। আক্রান্ত গাছ তুলে শীষ পাতার খোলা দাড়িয়ে দেখা গেল সাদা গুঁড়ো মাখা সুতোর মত আস্তরণের নীচে ওগুলি কি। ছোট, বাদামি সাদা, নরম শরীরের পাখাবিহীন ডিম্বাকৃতি পোকা অনেক, চাপ বেঁধে আছে কান্ডের গায়ে। কীটতত্ত্ববিদ চিনিয়ে দিলেন দ'য়ে পোকা। বললেন — মাঠে আলের ধারে এবং এখানে সেখানে উঁচু জায়গাতেই শুধু লেগেছে। রস শুষে খেয়েছে। ফলে গাছ বাড়েনি। পাতা লালচে আভা নিয়েছে এবং খোলার ঐ লক্ষণ। বললেন - খুব বেশি লাগলে কোন শিরাবাহি কীটনাশক দিতে হবে। বাদামি পচা খোলা রোগের ওষুধে তাই কাজ হয় নি।

দেশজ সুরক্ষা ব্যবস্থা

গাছ দিয়ে গাছের সুরক্ষা ঃ ফসলের মাঠে যেখানে সম্ভব মাঝে মাঝে কড়া গন্ধ ছাড়ে যেসব গাছ যেমন তুলসি অথবা রসুন অথবা পেঁয়াজ অথবা গেঁদা লাগালে অনেক পোকামাকড় ঐ মাঠে ঢুকতে চায় না। এর মধ্যে গেঁদার ঝাড় থাকলে জোরে বাতাস দিলেই কড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পোকামাকড় বিদায় হয় ঐ গন্ধে। আবার গেঁদার শিকড় থেকে যে রস মাটিতে বের হয় তা কৃমি (নিমাটোড) খুব পছন্দ করে, কিন্তু ওর বিষক্রিয়াতে কৃমি মারা পড়ে। তিন কেজি গেঁদা ফুল থেঁতো করে ২০০ লিটার জলে গুলে ফসলে স্প্রে করলেও অনেক পোকা লাগা কমে। তবে স্প্রেটা করতে হবে চড়া রোদের মধ্যে। মেঘলাতে নয়। কারণ এই দেশজ ওষুধটা রোদ্দুরেই বেশি বিষক্রিয়া দেখায়।

(সূত্র ঃ এল.নারায়ণ রেড্ডি, শ্রীনিবাসপুর, কর্ণাটক)

ছাই দিয়ে শস্য সুরক্ষা ঃ রাজস্থানের মরু অঞ্চলে রান্নাঘর থেকে পাওয়া ছাই দিয়ে ফসলের নানা রোগের উপশম ঘটান চাষীরা। বাজরার পুরানো আটার সঙ্গে ৪ ভাগের ১ ভাগ ছাই মিশিয়ে জিরাতে ফুল আসার আগে ডাস্ট করলে সাদাগুড়ো বা পাউডারি মিলডিউ রোগ লাগে না।

- লুসার্ন ফসলে খুব স্বর্ণলতা লাগে ওখানে। ছাই-এর সঙ্গে গুঁড়ানো লবণ মিশিয়ে হেক্টরে ৫০-৬০ কেজি ডাস্ট করলে স্বর্ণলতা লাগে না।
- তুলোর বীজতলাতে খুব চারা ধ্বসা লাগে। ছাই-এ কেজি প্রতি ২৫০ গ্রাম রেড়ির তেল মিশিয়ে বীজ তলাতে ছড়ালে চারা ধ্বসা কমে যায়।
- সর্ষের প্রধান রোগ সমস্যা ওখানে সাদামর্চে, তুলোরোগ (ডাউনি মিলিডিউ) এবং সাদাগুঁড়া রোগ। ফসলের ওপর ছাই ডাস্ট করলে এই রোগগুলি প্রশমিত হয়।

(সূত্রঃ সেন্ট্রাল এরিড জোন রিসার্চ ইন্সটিট্যুট, যোধপুর, রাজস্থান)

ছাই ও কেরোসিন তেল মিশিয়ে ফসলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে অনেক পোকামাকড় তাড়াতেন বাড়ির বাগান থেকে আমাদের রাজ্যের মহিলারা।

পোকা ধরা ফাঁদ ঃ আলোফাঁধ

পোকা ধরার আলোক ফাঁদ

আলো প্রায় সব পোকাকেই আকর্ষণ করে। দেওয়ালির সময় অনেক সবুজ শ্যামাপোকা, হলুদ মাজরা পোকা, বাদামি শোষক পোকা, সাদাপিঠ শোষক পোকা, ভেঁপুপোকার মাছি আলো দেখে ছুটে আসে। বর্ষাকালে পাটের শুঁয়োপোকার মথ, আমজাতীয় ফল গাছের কান্ড ছিদ্র করা পোকা, লম্বা শুঁড় ধূসর লম্বাটে পূর্ণাঙ্গ আসে। এইসব পোকা ফসলে নেমে ডিম পাড়ার আগেই যদি আলো ফাঁদে ধরা পড়ে তবে শত্রু পোকার বংশ বৃদ্ধি হয় না। ফলে সংখ্যা কমে যায়। এবং আগে থেকেই জানা যায় কোন পোকা আসছে বা বাড়ছে।

চুঁচুড়া ফার্মের যে আলো ফাঁদ মডেল ছিল তাতে মাঠের ধারে হাত দুয়েক উঁচু কাঠামোতে গ্যালভানাইজন সিট এর বড় মাপের ফোঁদল (ফানেল) বসানো হয়। এর ওপরে ঝোলানো থাকে আলো। বৈদ্যুতিক বাল্ব অথবা হ্যাজাক জাতীয়। ফোঁদলের নীচে সরু নলের তলায় থাকবে বিধ-জল পাত্র। থালার মত পাত্রে কেরোসিন-জল। কি পোকা কেমন সংখ্যায় আসছে জানতে সন্ধ্যা থেকে ঘন্টা দুয়েক পরে জলে পড়া পোকার সংখ্যা ও পরিচয় দেখে নেওয়া যায়।

(**সূত্র ঃ** মনোজরঞ্জন ঘোষ, বিসিকেভি)

জৈবকীটনাশক ঃ নিমাটোড

কীটনাশক কৃমি

নিমাটোড বা কৃমির দুটি প্রজাতি যেমন হেটারোর‍্যাবডাইটিস ও স্টেনারনিমার জৈব কীটনাশক হিসাবে বিপুল সাফল্য জানা গেছে। আধুনিক নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে এদের সুলভ ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। কৃমিটি তৃতীয় দশার অযুবা (জুভেনাইল গুলো মাটিতে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। পোষক কীটের লার্ভা বা গ্রাবকে খুঁজে বের করে ওদের দেহরন্ধ্র বা কৃত্তিকাবরণকে ফুটো করে শরীরে ঢুকে পড়ে। তারপর কীটের দেহের অবরোধী ব্যবস্থাকে

প্রতিহত করে বংশবিস্তার করতে থাকে। কৃমিগুলো মিথোজীবি ব্যাক্টোরিয়া যথাক্রমে জেনোর‍্যাবডাস ও ফটোর‍্যাবডাস বহন করে। ফলে আক্রান্ত কীটশত্রু ২ থেকে ৪ দিনের মধ্যে সেপ্টিসেমিয়া হয়ে মারা যায়। কৃমিগুলোর কার্যকারিতা জমিতে ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত। এরা মাটিতে প্রয়োগের পর বহুদিন স্থায়ীভাবে মাটির পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে এবং কীটশত্রুর নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যেমন মিষ্টি আলুর কেড়ি পোকা, কাটুই পোকা, ধানের মাজরা, শীষকাটা ও লেদা পোকা, সজনের শুঁয়োপোক, বাদামের সাদা গ্রাব, বেগুনের কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, উঁইপোকা ইত্যাদি। তাছাড়া গৃহস্থলীর পোকামাকড় যেমন মাছি, আরশোলা, কালোমাছি এবং জলজ স্থানে বসবাসকারী বহু পোকা দমন করতে পারে।

এদের মাটিতে অথবা স্প্রে করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। জলসেচের আগে বা পরে হেক্টর প্রতি ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন ব্যবহার করা প্রয়োজন। গাছের উপরিভাগ ১০ শতাংশ গ্লিসারিন জল ও কৃমির সংমিশ্রনটিকে মিশিয়ে স্প্রেয়ারের সাহায্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিদেশের বাজারে কৃমিগুলোকে বীজের গায়ে মাখিয়ে বিক্রি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কীটশত্রুর রোগ সৃষ্টিকারী কৃমির ব্যবহার ও কীট দমনে কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেক বেশি।

(**সূত্র** ঃ মতিয়ার রহমান খান, বিসিকেভি, কল্যাণী)

লাল সংকেত

পাঞ্জাব সত্যই কি ক্যানসার রাজ্য হয়ে যাবে? অনেক বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট বেশ কিছুদিন ধরে সাবধান করলেও রাজ্য সরকার এই অমোঘ সত্যটা মানতে পারছিল না। কিন্তু দুটি রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমত যে জল বেশিরভাগ রাজ্যবাসি পান করছেন তা বিষাক্ত, বিশেষত যেসব অঞ্চলে অত্যাধিক পেস্টিসাইড ব্যবহার হচ্ছে। দ্বিতীয়ত পেস্টিসাইড চাষীদের জিনের ক্ষতি করছে। ফলে মিউটেসন এবং ক্যানসার হচ্ছে। ট্রেপ ভর্তি ক্যানসার রোগী চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে ক্যানসার রেজিস্ট্রি তৈরি করেছে। জনস্বাস্থ্য এখানে সংকটাপন্ন। পাঞ্জাবে এখন খাদ্য, মাটি, জল, বাতাস এবং মানুষের দেশ বিষ-রাসায়নিক আক্রান্ত। মালওয়া অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি পেস্টিসাইড ব্যবহার হয়, বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। তুলো চাষীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। বিজ্ঞানীরা বলছেন এর থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে না।

আমাদের দেশে কোন নিয়মিত বায়ো-মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। যা হয় তা এখানে সেখানে একটু আধটু। রাসায়নিক এখানে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে পেস্টিসাইড শিল্প যে অর্গানোফসফেট গোষ্ঠির পেস্টিসাইডকে বলে আসছে 'অবশেষে' থাকে না, কোন বিপদ নেই, এখন দেখা যাচ্ছে তাও চাষীর ডিএনএ নষ্ট করেছে। আমাদের দূর্বল 'নিয়ন্ত্রন' ব্যবস্থা পেস্টিসাইড শিল্পের অপপ্রচারকে থামাতে পারছে না।

ক্যান্সার আক্রান্ত পাঞ্জাবের বলজিত কাউর

২০০৩-২০০৬ সালে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে দেখা গেছে টাটকা নমুনার (স্প্রে করার পরদিন নেওয়া) ৩৬ শতাংশতে ছিন্নভিন্ন ডিএনএ। ছ'মাস পরের নমুনাতে এটা কমলেও ১৫ শতাংশ রয়ে গেছে। কোষের ডিএনএ 'রিপেয়ার' প্রক্রিয়া অক্ষম। রাজ্যসরকার চন্ডীগড়ের পোস্টগ্যাজুয়েট ইন্সটিট্যুট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর সহায়তায় ক্যানসার রেজিস্ট্রি প্রকল্প চালু করেছে জুলাই মাসে। সর্বাধিক ক্যানসার পীড়িত অঞ্চল মুন্দসর থেকে শুরু।

(**সুত্র** ঃ ডাউন টু আর্থ, জুন, ১-১৫, ২০০৮)

ফসলের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ঃ নাইট্রোজেন পুষ্টির সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব চাষের জমিতে অল্প বিস্তর নাইট্রোজেনের অভাব আছে। এই নাইট্রোজেন খাদ্যমৌল ফসলের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যামাইড ও অ্যালক্যালয়েড তৈরি এবং পাতার ক্লোরোফিল গঠনের অঙ্গ। এই নাইট্রেজেনই স্থির করে ফসলের কার্বোহাইড্রেট কি কাজে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ কখন গাছের ডালপালা বৃদ্ধির কাজে লাগবে কখন মূলতঃ ফল ফুলের ফলনে ব্যবহৃত হবে।

নাইট্রোজেন বিহীন ভুট্টাগাছের লক্ষন ও নাইট্রোজেন যুক্ত সতেজ গাছ (নীচে)

স্বভাবতই নাইট্রোজেনের অভাব হলে প্রথমেই গাছের পাতার ক্লোরোফিলের পরিমান কমে। ফলে পাতার সবুজ রং হালকা সবুজ থেকে হলদেটে সবুজ হয়। তখনো যদি গাছ নাইট্রোজেন খাবার না পায় তাহলে পুরোনো পাতা শুকিয়ে যায় বা ঝরে পড়ে। গাছের সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে গেলে বুঝতে হবে মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব খুবই বেশী।

মাটিতে যথেষ্ট পরিমানে নাইট্রেট নাইট্রোজেন থাকা অবস্থাতেও কোন কোন জমিতে ফসলে নাইট্রোজনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়। এক্ষেত্রে সবার আগে দেখতে হবে ঐ মাটিতে মলিবডেনামের অভাব আছে কিনা। গাছ মাটি থেকে নাইট্রেট নাইট্রোজেন গ্রহণ করার পরই গাছের শরীরের মধ্যে ঐ নাইট্রেটকে বিজারিত করে নেয়। বিজারিত হওয়ার পরই গাছ ঐ নাইট্রোজেনকে খাদ্য মৌল হিসাবে কাজে লাগায়। এই বিজারণ প্রক্রিয়ার জন্য মলিবডেনামের উপস্থিতি একান্ত দরকার। সেইজন্য মাটিতে মলিবডেনামের অভাব হলে গাছের ভেতরে নাইট্রেট জমা হয়ে বিষক্রিয়া করবে এবং গাছে নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যাবে।

মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব হলে যেকোন দানা শস্য ফসলে প্রথম অবস্থাতেই বাড় বা বৃদ্ধির হার নজরে পড়ার মত না হয়ে কম হয়। তার সাথে পাতার রং হালকা সবুজ বা হলদেটে সবুজ হয়। তখন নাইট্রোজেন সার না দিলে পরে থোড় আসতে দেরী হয় ও ফলনও নিশ্চিতভাবে কমে।

নাইট্রোজেন বিহীন হলুদ রং-এর ধান চারা ও নাইট্রোজেন যুক্ত সতেজ ধানচারা (পিছনে)

রাইজোবিয়াম জীবাণু শিম্বি ও কয়েকটি অশিম্বি জাতীয় গাছে শিকড় আশ্রয় করে বাতাস থেকে নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করে। এই রাইজোবিয়াম গাছের শিকড়ে অর্বুদের মধ্যে বাস করে। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিজের শরীরে আবদ্ধিকরণের পর তা আশ্রয়দাতা গাছকে সরবরাহ করে। বিনিময়ে তার বৃদ্ধির জন্য শক্তির উৎস কার্বোহাইড্রেট গাছের কাছ থেকে নেয়। মাটিতে গ্রহণযোগ্য কোবাল্টের অভাব হলে এবং ঐ বিশেষ প্রজাতির রাইজোবিয়াম জীবাণুর অভাব থাকলে উপরে বলা বিনিময় পদ্ধতির মাধ্যমে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে আবদ্ধ করতে

পারে না - তখন ফসলে নাইট্রোজেনের অভাবের লক্ষণ দেখা যায়।

কোন ফসলে নাইট্রোজেনের অভাব হয়েছে তখনই বলা যাবে যখন নাইট্রোজেন দিলে সেই ফসলের যে অংশের ফলনের জন্য চাষ হয়েছে তা বৃদ্ধি পায়। যেমন আখ চাষে সবচেয়ে বেশী চিনি উৎপাদন করতে যে পরিমান নাইট্রোজেন লাগে সেইটাই উপযুক্ত পরিমান। আখ গাছ কত বেশী লম্বা হল সেটা কোন ব্যাপার নয়।

নাইট্রোজেনের অভাবজনিত সর্ষে পাতার বিভিন্ন উপসর্গ

রাইজোবিয়াম গুটি

অভাবের লক্ষণ সাধারণভাবে হলুদ অথবা হলুদ-সবুজ পাতা, কম পাশকাঠি এবং বৃদ্ধির অভাব। শেষ পর্যন্ত অভাব থাকলে শীষ প্রতি দানার সংখ্যাও কমে। এছাড়া প্রথম দিকে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকলে এবং পরে কম পড়লে নীচের পাতাগুলো প্রথমে হলুদ হবে। নতুন পাতা যা বেরোবে তা স্বাভাবিক সবুজ থাকবে। তবে পরে সমস্ত ফসলটা সমানভাবে হলুদ হবে। নাইট্রোজেনের সংগে সুষম ফসফরাস থাকলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। আবার পটাশ সার সঠিক মাত্রায় থাকলে গাছের নাইট্রোজেন গ্রহণের মাত্রা বাড়ে। অর্থাৎ পটাশের উপস্থিতিতে কম নাইট্রোজেনে অধিক ফলন দিতে পারে গাছ। বিশেষত আলু ও মিষ্টি আলু ক্ষেত্রে এটা খুবই স্পষ্ট। কলা, পেয়ারা, আনারসের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। নাইট্রোজেনের সাথে সালফারও সুষম পরিমানে থাকলে একে অন্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। নদীয়াতে পরীক্ষায় দেখা গেছে সরষের ফলন বাড়ানো যায় নাইট্রোজেন-ফসফেটের সাথে জিপসামের মত সালফার বা বোরণ সার প্রয়োগে। বাদামের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশ সুষম ভাবে দিয়ে জিঙ্ক সারও দেওয়া হলে ফলন বেশি হয়। অর্থাৎ নাইট্রোজেনের সাথে এইসব সার দেওয়া হলে নাইট্রোজেন সার বেশি কার্যকর হয়।

মাটিতে ইউরিয়া, ডি.এ.পি বা অ্যামোনিয়াম সালফেট নিয়মিত দিয়ে গেলে যে অ্যামোনিয়াম আয়ন সৃষ্টি হয় তা জীবাণুর প্রভাবে যখন নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয় তখন দুটি H+ আয়ন সৃষ্টি করে যাতে মাটির অম্লত্ব বাড়ে। এছাড়া প্রচুর বৃষ্টিতে কাদাকণা ও হিউমাসের গা থেকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধুয়ে যাওয়া তো আছেই। ফলে অম্লমাটিতে ক্যালসিয়াম কম পড়লে নাইট্রোজেনের গ্রহণযোগ্যতা কমে। তাই ঐসব নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে হিসাব মত মাটিতে চুন প্রয়োগও প্রয়োজন। সব মিলে ফসলের মাঠের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি মৌল নাইট্রোজেন ব্যবহারে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা দরকার ফসলের সুস্থতা বজায় রাখতেও সর্বাধিক ফলন পেতে।

(**সূত্র** ঃ অসিত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিসিকেভি, কল্যাণী)

আগাছা পরিচিতি

মুথা ঘাস ঃ একাধিক প্রজাতির মুথা জন্মায়। সাইপেরাস ডিফরমিস, সাইপেরাস ইরিয়া, সাইপেরাস রোটান্ডাস প্রভৃতি। খাড়া, মসৃন ঘন হয়ে বেড়ে ওঠা মরশুমী এই আগাছা ২০-৭০ সে.মি লম্বা হয়। কান্ড মসৃণ, ওপরদিকে তেকোনা ও ১-৪সেমি মোটা। অসংখ্য সুতার মত লালচে শিকড়। পাতার খোলা নলের মত গোড়ার কাছে জোড়া। নীচের পাতাগুলি খড়ের রঙ থেকে বাদামি। পাতার ফলক রেখার মত লম্বা, মসৃণ এবং ফুলের ডাঁটার চেয়ে লম্বায় ছোট। লম্বায় ১০-৪০ সেমি এবং চওড়ায় ২-৩ মিমি। পুষ্পমঞ্জরী ঘনসন্নিবদ্ধ, গোল, সরল বা যৌগিক অ্যামবেল।

৫-১৫ মিমি ব্যাস, ২-৩ টি পাতার মত অঙ্গ দ্বারা প্রলম্বিত। ফুলের প্রথম সারির পাপড়িগুলি ২-৪ সেমি লম্বা এবং দ্বিতীয় সারির গুলি ১ সেমি লম্বা। কিছু থাকে বৃন্তহীন কিছু লম্বা বৃন্তযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতি 'অ্যাকিন', গায়ে গর্ত গর্ত দাগ, বাদামি রঙ এবং ০.৬ মিমি লম্বা। আগাছাটি বীজ এবং কাটা কন্দ দিয়ে ছড়ায়। মাটির গভীরে থাকা কন্দ এর নিয়ন্ত্রণে প্রধান সমস্যা। সাইপেরাস ডিফরমিস ছাড়া অন্য প্রজাতিগুলির ফুল অন্য ধরনের। গোল নয়, লম্বা নিয়মিত গভীর মাটি চষলে এবং ফসল চাষ করলে এর প্রকোপ ধীরে ধীরে কমে।

মুথা ঘাস

সুরক্ষা খবর ঃ আফগানিস্থানে পঙ্গপাল দমনে বিভ্রাট

উত্তর পশ্চিম আফগানিস্থানে এপ্রিলের গোড়াতে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এল। আফগানিস্থানের প্রশাসন ঘোষণা করে যে প্রতি কেজি মৃত পঙ্গপাল জমা দিতে পারলে ৭ কেজি গম দেওয়া হবে। মানুষ কাজে নেমে পড়ে এবং ১৫ দিনের মধ্যে ন্যাশানাল ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ৯,৬০০ কেজি মেরে ফেলা পঙ্গপাল পেয়ে গেল। মৃত পঙ্গপাল জমা দিয়ে 'রিসিট' পাওয়া গেলেও গম পাওয়া যায়নি। পঙ্গপাল সফলভাবে দমন হয়ে গেল। আফগান সরকারের গুদামে গম নেই। তাঁরা ইউ এন ওর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

(সূত্র ঃ ডাউন টু আর্থ, অগাস্ট - ১-১৫, ২০০৮)

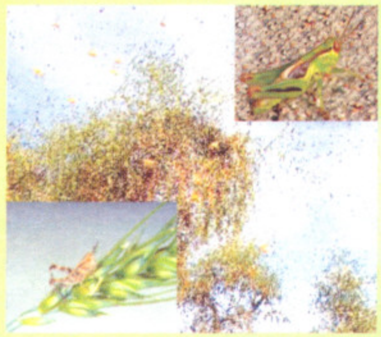
পঙ্গপালের ঝাঁক ও আক্রান্ত গমের শিষ

সুরক্ষার কেলেঙ্কারি

সময়টা ২০০১ সাল। কেরালার উপকুল অঞ্চল জুড়ে নারকেলের মাকড় সমস্ত ফলগুলি শোষণ করে সবুজ উপরিস্তরে বাদামি পোড়া অংশ নিয়ে বাজারে আসছে। কেরালা সরকারের কৃষি বিভাগ পরিকল্পনা করে সমস্ত নারকেল বাগানে অত্যন্ত কার্যকর পেস্টিসাইড 'ডাইকোফল' স্প্রে করতে বিশাল 'নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এ বিষয়ে থিরুবনন্তপুরমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হল বড় বড় ব্যক্তি, আমলাও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রভাকরণ নায়ারকে দিয়ে এই মিটিং-এ অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার মতলব ছিল। ড. নায়ার পিছনের ব্যাপারটা কোন সূত্রে জেনে ফেললেন। জানলেন ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করার হবে মারাত্মক বিষাক্ত - ডাইকোফল' যা ১৯৭০ সালেই আমেরিকা ও ইউরোপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খেলাটির পিছনে পেস্টিসাইড শিল্পও আছে। ৩৬ কোটি টাকার 'অর্ডার' পাবে। সরকারি লোকদের সাথে পেস্টিসাইড শিল্পপতিরা হাত মিলিয়ে পরিকল্পনাটা করেছে। ড. নায়ার বিরোধিতা করলে, প্রচার মাধ্যমও এগিয়ে এল। এগিয়ে এল বিরোধী দল। কৃষিমন্ত্রী প্লেনে চেন্নাই গিয়ে অন্য কোন বিজ্ঞানীর অনুমোদন আনার চেষ্টা করলেন। পেয়েও গেলেন। ড. নায়ার কিছু বন্ধুকে নিয়ে কেরালা হাইকোর্টে আবেদন করলেন। তারপর শুরু হল ভয় দেখানো, দৌলতের লোভ দেখানো, এবং নানাভাবে হেনস্থা করা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে। কিন্তু 'ডাইকোফল' ব্যবহারটা বন্ধ হয়ে গেল।

(সূত্র ঃ nair_kpp@yahoo.com.)

2006

যে কোন শস্য সুরক্ষা জনিত সমস্যার জন্য যোগাযোগ করুন

উদ্ভিদ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী : নদীয়া
ফোন নং : ০৩৩–২৫৮০৮৫১১ এক্সটেনশন : ৪৭

সরাসরি যোগাযোগের ঠিকানা

ড. শান্তনু ঝা, সচিব, এ এ পি পি,
দুরভাষ : ০৯৪৩৩০১১৫২৯
ফ্যাক্স : ০৩৩–২৫৮২৭৪৭৪
E-mail : aapp_bckv@yahoo.co.in